একটা অন্ধকার সম্মেলন, তার অ ালো

ঋিজিৎ অধিকারী

অন্যান্য আর পাঁচটা দিন যেমন হয় আজও তেমনই। ভাঙা বেড়া টপকে চক্কোত্তি- ভিটেতে পা দিতেই - গাটা ছমছম করে উঠল শঙ্করের। জল-কালা নিয়ে দু-আড়াই বিঘের আবাড়। ছোট বড় তিনটে পুকুর পিছন দিকে, বলতে গেলে জলে মাছে সমান। তারপর আম-জাম-সবেদা-কাঁঠালের বাগান। তারও দক্ষিণে প্রশস্ত খামার, টিনের ছাওয়া মস্ত ধানের মরাই, আর নিস্তব্ধ কোঠা বাড়ি। খামারের একপাশে সার সার ধানের গাদা। বাড়ির সামনের দিকে আরও একটি পরিষ্কার বড় পুকুর। তবে শঙ্করের আনাগোণা ভিটের পিছন দিকে তিনটে পুকুরেই।

সমস্ত সমৃদ্ধ আয়োজন এই, মাত্র দ্বিতীয় প্রহরের আঁধারেই একটান ঝিঁ ঝিঁ ডাকের ভিতর ঝিম মেরে আছে। তাই খুব স াহসী লোকেরও এ সময় এখানে এসে ভয় পাওয়া লজ্জার নয়। শঙ্কর দোলাই পোড় খাওয়া মানুষ। অন্ধাকারের চোখ মুখ তার চেনা। বিপদের ঘ্রাণ আগাম এসে তার নাকে ঝাপটা মেরে যায়। সেই তারও বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে, গায়ের রে ামগুলো খাড়া হয়ে যায় এখানে এলেই।

পুকুরের চারপাশে জ্বালানির গাছ। বড় বড় শিরীষ, অর্জুন হিজল। আর হাওয়া গলে না এমনই ঘন ভালকি কাঁটা এবং তরল বাঁশের ঝাড়। দিনের বেলাতেই মাটিতে রোদ পড়ে না। এখন গাঢ় অন্ধকার লেপটে আছে। সন্ধ্যের আগে বৃষ্টি হয়েছিল খানিকক্ষণ ঝিম্ ঝিম্ করে। ঝরা পাতার নিচে প্যাচপ্যাচে কাদা। একটা অদ্ভুত অন্ধ যেন থম মেরে আছে। তাতে মিশে আছে পচা পাতার গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ আর পুকুর থেকে উঠে আসা পুরনো আঁশটে গন্ধ।

সুত মানে তিরিশ চল্লিশ হাত লম্বা, স অথচ শক্ত নাইলনের সুতো। তার এক প্রান্তে দশ বারোটা কাঁটা স্প্রিং দিয়ে সাজানে া। স্প্রিং- এর চাপে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে থাকে ফুলের পাপড়ির মত। অন্য প্রান্ত একটা তরলবাঁশের চোঙের গায়ে গোটানে া। চঙের ভেতর একটা শক্ত কাঠি। মাছের পছন্দ সই চার আঠালো করে মেখে থোকা কাঁটাঢেকে গোলা পাকাতে হয়। সেই গোলা ছুঁড়ে দিতে হয় গভীর জলে। কাঠিটা পুঁতে দিতে হয় পাড়ে। আলগা সুরকি -বাঁধন থাকে কাঠির মাথায়। অল্প ট ানেই সে সুরকি খুলে যায়। তারপর সুতোর টানে বাঁশের চোঙ ঘর ঘর শব্দ তুলে ঘুরতে থাকে। তখনই বুঝতে হয় চারে ম াছ লেগেছে। অব্যর্থ কাঁটা গুচ্ছ, নিঃশব্দ শিকার।

তিনটি পুকুরের জন্য তিনটে সুত আর মাছের চার সমেত ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় শঙ্কর। টানের চোটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা লাল আলো করতলের আড়ালে ঢেকে সে বিড়ি খায় এবং এই অবসরে চারপাশেরপরিবেশটা বুঝে নেওয়ার জন্য উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বিশেষ ইন্দ্রিয়কে সচল করে। তারপর ধূমপান শেষ হলে তিনটি পুকুরে তিনটে সুত ফেলে দিয়ে আঁধারে আঁধার হয়ে অপেক্ষায় থাকে।

সে বেড়ালের পায়ে হেঁটে যায় এ পাহাড় থেকে সে পাড়। ঝোপের কটাশ, ভাম, উদ্‌বেড়াল তাকে চেনে। প্রতিটি গাছের শ াখাপ্রশাখা, ঝুঁকে থাকা বাঁশ, বিছুটি বন, কানকুলের কাঁটাময় ঝোপ সব- তার জানা। যেহেতু মাসের পর মাস গেলেও র াতে দূরের কথা, দিনের বেলাতেও সহসা এদিকটা কেউ মাড়ায় না। তাই এই এঁদো বনবাদাড়, শুকনো ঝরা পাতা, পুকুর, পুকুরের মাছ সবাই তাকে মালিক বলে মেনে নিয়েছে। গাছের বাকলে বাকলে লেগে আছে তার হাতের স্পর্শ, পুকুরের ক াদায় ফুটে আছে তার অসতর্ক পায়ের ছাপ, হাওয়ায় মিশে আছে তারশ্বাস - প্রশ্বাস।

মাছ ধরার আসল ব্যাপার হল ধৈর্য। তা সে জিনিসটা শঙ্করের ভালই আছে। কারণ এ হল তার সাতপুষের বিদ্যে। তার দাদু বনমালী দোলাই, ফিসফিস করে নয়, পড়শী জানান দিয়েই শোনাত তার নিশি জেগে মাছ ধরার আজব বেত্তান্ত। এমনকি সে নাকি রাতের অন্ধকারে মাছের নেশায় পাঁচ - সাত মাইল দূরের পুকুরেও হানা দিয়েছে। নিশ্চুপ বসে থেকেছে শেষ রাত পর্যন্ত। খরিশের বিষদাঁত, চোর ডাকাতের ছোরা, বল্লম, ভূত প্রেতের ছম ছম ছায়াকে পাশ কাটিয়ে সে কতবার তুলে এনেছে দশ পনের সেরি প্রাচীন ই কাতলা মৃগেল। শঙ্কর বলত, দাদু ভূত দ্যাখ্‌ছো ঞ্জ বনমালী হেলায় উত্তর দিত, কত ক্ক দাদুর নেশা শঙ্কররেও শিরায় শিরায়। তবে অশরীরী ছায়া কখনও তার চোখে পড়ে নি। অবশ্য কিছুই যে সে টের পায় নি তাও তো নয়। কোথাও কোথাও বন - বাদাড়ের ভেতর অদ্ভুত হাওয়া বয়। কখনও একটা পাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ, খুব বিচ্ছিরি স্বরে, যে পাখির ডাক সে আগে কখনও শোনেই নি। আবার কখনও খোঁটা ঠোকবার মত শব্দ সোনা যায় বার কয়েক, তারপর সব চুপচাপ। হঠাৎ কোন বন-বাদাড়ের পথে অহেতুক গায়ে কাঁটা দেয়। ভয় পেয়ে যায়শঙ্কর। তবু এই বুক কাঁপানো ভয়ের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকবার যে কি মজা তা সে অন্য কাউকে বোঝাতে পারবে না।

অন্ধকারে চরাচর ডুবে আছে। ফিস ফিস কথাবার্তা বলছে কারা। শিরীষ - অর্জুনের শাখায় শাখায় সারি সারি মৃত্যুর পাখি বসে আছে। তাদের খ্যারখেরে ডাক। সে ডাকে বুক চিরে যায়। অন্ধকার ঠেসে ধরে আছে। মৃত্যুর ভিড়ের ভেতর একা সজীব শঙ্কর, চার ফেলে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। কার গরম চওড়া জিভে তার বুক পিঠ চেটে দিয়ে যাচ্ছে। কার রিন রিন ডাক বাজছে কানের কাছে। তবু শঙ্কর সে ডাকে সাড়া দেবে না। পালিয়ে যাবে না। শীত -সদৃশ গাঢ় এই ভয়ের আয়োজনের ভিতর দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে অন্ধকার জল থেকে তার চারে লাগা মাছ সে তুলবেই।

চক্কোত্তি বাড়ির কেউ মরলে তাকে ভিটের মধ্যে পোড়ানোই রীতি। কত - বামনির শেষ শয্যা পাতা আছে এখানে। অন্ধকারে সেই সব মাটির বিছানা শঙ্করকে মাড়িয়ে যেতে হয়। চক্কোত্তিরা ছিল হাড় কিপটে। সাতপুষের টিপে টিপে জমানো টাকায় এ বিপুল সম্পত্তি জমে উঠেছে আজ। অনেকে বলে মরেও না কি মানুষগুলোর স্বভাব যায় নি। কত শুকনো কাঠকুটো জমে খত হচ্ছে, কত লম্বা লম্বা বাঁশ পেকে শুকনো হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তবু একটুতে কারও হাত দেবার জো নেই। পরাণ মাহালি তাঁত বুনে খায়, সে কটা তরল বাঁশ কাটবে বলে ঢুকেছিল। সেশুনেছে। শুকনো কাঠ ভাঙতে এসে শুনেছে ঘড়াই বুড়িও। হঠাৎ কেউ ধারানো খ্যারখ্যারে গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে। দূর দূর করে তাড়ায়। তারা নাকি চিনতেও পেরেছে তাকে। অবিকল নাকি ষষ্ঠীচরণের প্রথম পক্ষ দুর্গাঠাকরণের গলা।

শঙ্কর অবশ্য গভীর রাতের আগন্তুক হয়েও এ যাবৎ কোনও বাধা পায় নি। ঐ সব গল্পগুলো মনে পড়লে গা টা ছমছম করে অবশ্য, তার বেশী কিছু নয়। সে বরং এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে মনে হাসে।এতকাল ধরে জমানো বৈভব ভোগ করার জন্য কে রইল? প্রথম পক্ষ বাঁজা বলে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল ষষ্ঠীচরণ। সেই দ্বিতীয় পক্ষও এখন রোগশয্যায়। তিরিশ পার হওয়া ছোট মেয়েকে নিয়ে বিশাল মন্দিরে একটি টিমটিমে প্রদীপের আলোর মত করে বেঁচে আছে। বড় মেয়ে মারা গেছে বছর দুই আগে। এখন কমলা বামুনির দু-চোখ বুজলেই রাজকন্যা সহ বড় সাম্রাজ্য একেবারে আগল হারা। চতুর্দিকে শেয়াল শকুনেরা সব ছোঁক ছোঁক করছে।

তবে শঙ্করের তেমন পাপ মন নয়। লোভ আছে, তবে বউ - ছেলে - পুলে নিয়ে সে ঘোরতর সংসারী। ধর্মভী শঙ্কর টেনে রেখেছে একটা সীমাও। আর যেখানে যে যা পারে কক শুধু বনবাদাড় যেরা এই তিনটে পুকুর, সারাদিনও নয় খালি ক-ঘন্টা গাঢ় অন্ধকারের সময় তার মালিকানায় থাক, এইটুকুই সে চায়। এর দক্ষিণে সেএগোতে চায় না। আসলে শঙ্করের নেশা। ক-দিন পরপর ঘুমিয়ে রাত কাটালেই তার মনট কেমন ফস ফস করে। রাতের অন্ধক ার আর অন্ধকার জলের নিচের রূপলী জীবগুলো তাকে জাগায়। তারপর দশ বিঘের বন্দে নাড়া ফটফটিয়ে বা বর্ষার দিনে কাদা চটকিয়ে টেনে নিয়ে আসে এখানে।

ভয়ঙ্কর মশার আত্রমণ চলেছে অবিরত। সশব্দে চাপড়ে মারার উপায় নেই। কেবল অবিরাম দুই হাত ঘসেযেতে হয় সর্বাঙ্গে। মাঝে মাঝে ঘুরে দেখে আসতে হয় কাঠিগুলো। আজ এই তৃতীয় বার শিরীষ তলায় ছেঁড়া চটেরআসন ছেড়ে শঙ্কর ওঠে। এবং উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ কেন যেন তার হৃৎযন্ত্র একটু ধড়ফড় করে ওঠে। তবু অভ্যাস বসত শঙ্কর এগোয়।

পা টিপে টিপে প্রথম কাঠির কাছে যায়। কাঠির মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে যেমন সুরকি তেমনই আছে। দ্বিতীয় সুতেরও একই অবস্থা। এক এক দিন জলের নিচের অবোধ মাছও কেমন ছলনাময়ী হয়ে ওঠে। অমন সুস্বাদু চারেও মুখ লাগায় না।

রাত কাবার করে শূন্য হাতে ফিরতে হল শঙ্করকে। আজও কি তেমনই একটা দিন?
বড় পুকুরটায় যেতে হলে ছোট দুটো পুকুরের মাঝখানের স পাড় দিয়ে যেতে হয়। সেই পথে এগোতে গিয়েও কেন যেন অ াজ শঙ্করের পা আর উঠতে চায় না। যেন পেরেক দিয়ে পা দুটো মাটির সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে কেউ। গায়ে কাঁটা দেয়। অদূরে ঝোপের মধ্যে হুয়া হুয়া ডাক শোনা যায়। বুকটা কেঁপে ওঠে। খুব চেনা হলেওপ্রতিবারই শেয়ালের ডাকে কেমন একটা ভয়ের সুর মেশানো থাকে যেন। আর তার আলোয় সামনের স পথটার দিকে তাকিয়ে শঙ্করের হৃদস্পন্দন যেন একেবার বন্ধ হয়ে যায়। কে যেন বসে আছে পাড়ের উপর। কে ঞ্জ তার মত কেউ ঞ্জ না, তাই বা কি করে হবে ?
বজ্রপাতের চকিত আলোর পর আবার গাঢ় অন্ধকার চরাচরে সমস্ত দৃশ্য নিয়েছে। সেই ক্ষণিক আলোরস্মৃতি আর কল্পনায় মাখামাখি হয়ে যায়। শঙ্করের মনে হয় লোকটা ধুতি পরা, খালি গা। তবে কি ষষ্ঠীচরণ চক্কোত্তি, নাতারও আগের কোনও পুষ? নিজের অজান্তেই ঘন অন্ধকারের ভেতর এক এক পা করে পিছু হঠতে থাকে শঙ্কর। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড়। বাঁশ বাগান, ফলবাগান, বুনোলতার তৈরী ঘন জাল, কাঁটাঝোপ ভেদ করে জীবনপণ দৌড় শেষ হয় ফাঁকা খামার এসে।
খামারে অন্ধকার ঈষৎ পাতলা। অপেক্ষাকৃত অগভীর সেই আঁধারে যেন বুকে একটু সাহস ফিরে যায় শঙ্কর। কিন্তু এও টের পায় যে সে ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছে। এখন সে এখান থেকে বেরোবে কোন দিক দিয়ে ! আলো না ফুটলে পিছন দিক দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর সামনের দিকে জমজমাট বামুন পাড়া। জড়ানো লতারমত অলিগলি পথ। পথে এক হাঁটু কাদা, দুপাশে কাঁটাঁ বাঁশের ঘন বেড়া। শঙ্কর জাত চোর নয়। এই অন্ধকারে ঐসব পথের ঠাঁই ঠিকানা খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তাকে খামারে দাঁড়িয়ে দম নিতে নিতে ভাবতেহয়। একবার ভাবে যা হয় হোক, পরিচিত পুরানো পথেই ফিরে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। যদিও সে বনমালী দলাই-এ নাতি তবু দাদুর মতন বুকের পাটা তার নয়। ত াইশ্বাসের বেগ কমে এলেও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের ঘাম শুকোয় না। আর এমন সময় খড়ের গাদার দিকে চোখ পড়তেই ত ার বুকের রক্ত আরও একবার চলকে ওঠে।
গাদার আবছা অবয়বের পাশ থেকে বেরিয়ে অসছে আরও ঘন অন্ধকার একটা মূর্তি, তারই দিকে. এবার কোন দিকে য াবে শঙ্কর? পিছনের দিকে দৌড়বে?কিন্তু সে দিকেও তো পথ আগলানো। গলা শুকিয়ে কাঠ। হাত পা অবশ। মূর্তি আরও এগিয়ে আসে। তারপর হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই বিভীষিকা।
শঙ্করেরশ্বাস পড়ে না। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ভীষণ কয়েকটা মিনিট কেটে যায়। তারপর একসময় অন্ধকার মূর্তি ভয় মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করে কে? শঙ্কর উত্তর দিয়ে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলায়। কঁ াপা কাঁপা গলায় সেও পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়--তুমি কে? আবার সব চুপচাপ। কেউই আগে উত্তর দিতে চায় না।
আবার নিঃশব্দ অস্বস্তিকর কয়েকটা মিনিট। তারপর হঠাৎ টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ে শঙ্করের মুখে। সেও মরিয়া হয়ে টর্চ জ্বালে।
--- শঙ্কর! এত রাতে কোথা যাবি ? চাপা গলায় প্রশ্ন আসে।
--- তুমি বা এত রাতে এখেনে কেন বিনয় দা?
--- আমি অ্যাদের চাষবাস দেখেশুনে দি, সবাই জানে।
শঙ্কর কোনদিনই কথায় তেমন পটু নয়। তবু কে যেন আজ তার গলায় কূট কথার যোগান দিয়ে যায়। সে বলে, আমি যে ম াছ চোর এও তো গ্রামের সবাই জানে। কিন্তু এত রাতে কুতা আবার তুমার চাষের কাজ করল?
এ কথার কোনও উত্তর আসে না। শঙ্করের ভয় কেটে গেছে। এখন সে মরীয়া হয়ে যেন একটা যুদ্ধের মুখোমুখি। তার স ামনে বিনয় বেরা। বিনয় বেরাকে গ্রামের লোক সম্মান করে চলে। তার পুকুরে জাল দেবার জন্যমাঝে মাঝে ডাক পড়ে শঙ্করেরও। এমন প্রতিপক্ষের কাছে হেরে গেলে অপযশ নেই। বরং জিততে পারলে পৌষ বাড়ে। শঙ্কর প্রস্তুত।
আবার কয়েকটা মিনিট কাটে। বিনয় বুঝতে পারে, এই অন্ধকারের কেচ্ছা প্রকাশিত হয়ে পড়লে শঙ্করের চেয়ে তারই ক্ষতি হয়ে যাবে বেশি। তাই সে পরিস্থিতি বুঝে ভেঙে পড়বার আগেই মাথা নোয়ায়। আগের মত ই ফিসফিসে গলায় বলে, বাদ দে। ঘর যা।
প্রস্তাবে রাজি হয় শঙ্কর। কিন্তু ফিরে যাবার কথা ভাবতে গিয়েও তাকে থমকে যেতে হয়। অদূরে বাড়ির ভিতর থেকে ভীত ন

ারীকণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে আসছে। এতক্ষণ এখানকার উত্তেজনায় বোধ হয় তা আড়াল হয়ে ছিল। এত রাতে ক ারওজেগে থাকার কথা নয়। শঙ্কর বলে, ঘরের ভিতরে কি গোল হচ্ছে মনে হয়। কিছু কি বিপদ আপদ হল?
বিনয়ও শুনতে পেয়েছে। এদের বাড়ির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা শঙ্করের চেয়ে অনেকই বেশি। সে বলে, বলতো দেখি কি হল এত রাতে? জেঠীরই ঠিক বাড়াবাড়ি কিছু---
শঙ্কর দিনের বেলাতেও সহসা এ বাড়িতে কেন এ পাড়াতেই আসে না। তাই তার সঙ্কোচ হয়। বলে, এত রাতে যাবে, যদি কিছু খারাপ ভাবে?
তোর ভয় নাই। আমার সঙ্গে আয় না। যদি কিছু খারাপই হয়? আর তাছাড়া--- খানিক থেমে, গলা নামিয়ে বিনয় বলে ---আমরা তো খারাপই। ভালো লোক কি রাতের বেলাকুনোদিন কারো গাঁদালে কাঁদালে ঘুরে বেড়ায় বল?
বিনয়ের গলায় ফাঁসা খোলের বোলের মত স্বর। সেই স্বর শুনে শঙ্করও লজ্জা পায়। সেই লজ্জাকে ঢেকে রাখে অন্ধকারের চাদর। তবে যেহেতু মনের ভিতরে কোন দেয়াল নেই তাই তো কাঁটার মত খচখচ করে শঙ্কুরের বুকের কাছে। এতখানি বয়েস পার করে এসে আজ হঠাৎ নিজেকে খুব ছোট মনে হয় তার। বর্ষা দিনের একটা রাত যেন একটা বিশাল আয়না হয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে।
পাশ না করলেও কলেজ ছোঁয়া মানুষ বিনয়। মধ্য চল্লিশ। বোদ্ধা ও বিবেকবান হিসেবে গ্রামে তার অনেক সম্মান। গ্রাম্য বিচার - বন্দোবস্তে পক্ককেশ বৃদ্ধদের সঙ্গে সেও পায় মাথার মর্যাদা। আজ সেই তাকেও মেছুয়ার বাচচাশঙ্করের সঙ্গে সন্ধির জন্য ফর্সা হাত বাড়িয়ে দিতে হল অন্ধকাবে!
ষষ্ঠীচরণ ছিলেন বিনয়দের কুলপুরোহিত। তাই তাঁর মৃত্যুর পর গ্রামের কয়েকজনের প্রস্তাবে এবং নিজেরও বিবেকের স ম্মতিতে অসহায় বিধবার সম্পত্তি সামলানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয় বিনয়। বিনয়ের মা, প্রচলিত ধারণায় যার স্বভাব পেয়েই বিনয় আজ এমন দয়ালু ও পরোপকারী তাঁরও বিশেষ উৎসাহ ছিল এ বিষয়ে।
তারপর গ্রামে যে চিরাচরিত সমুদ্র সদৃশ গল্প মন্থনের প্রথা তাতে এই নতুন কাহিনীও সংযোজিত হয়। বেশকিছুদিন সেই মন্থনের ফলে বিনয়ের জন্য একচেটিয়া প্রশংসা ও আর্শীবাদ উঠে আসবার পর একদিন কি যেন একটুনীলবর্ণ জিনিস আ বিষ্কৃত হয়। এবং তা অবিলম্বে হাওয়ার আগে প্রচারিত হয়ে পড়ে। বাপ - ঠাকুদ্দার উপর চোখেরস্বভাব নাকি সম্প্রতি বিনয়েরে মধ্যেও দেখা যেতে শু করেছে।
এই তৃতীয় নয়ন প্রসঙ্গে বাপ-ঠাকুদ্দার অনেক বৃত্তান্তই আবছা শোনা আছে বিনয়ের। বাপের মৃত্যুর পরসে সব বৃত্তান্ত অনেকদিন মরেই পড়েছিল। আজ আবার তারা বেঁচে ওঠায় পূর্বপুষের বিশেষ রূপটি বিনয় দেখতে পায়। তার মা এই এতগুলো বছর পক্ষী-জননীর প্রসারিত ডানার মত আঁচলের আড়ালে নিজের মনের মতকরে মানুষ করেছিল তাকে। তার সব ভুলে যাবারই কথা। কিন্তু কতদিনই বা ভুলে থাকা সম্ভব ?
এত বয়স পর্যন্ত মোটামুটি নিষ্কলঙ্ক বিনয় তার সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনী শুনে প্রথম ক-দিন সুতীব্র রাগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর মায়ের কানেও এসব যেতে পারে, এই আশঙ্কায় তার মনে গভীর দুঃখের ছায়া পড়ে। তারও কদিন পর এই ছায়া ক্রমে ক্রমে কবে যে গাঢ় অন্ধকার হল তা তার ঠিক মনে নেই।
এতদিন অবহেলা করে এলেও উড়ে বেড়ানো গল্প শোনবার পর একদিন তার চোখে রাণী মানে ষষ্ঠীচরণের ছোট মেয়ের উৎকৃষ্ট গড়ন আবিষ্কৃত হল। মনে পড়ল ঘরের খেয়ে পরের বাড়িতে নিঃস্বার্থ শ্রমের কথা, নিজেকে মনে হল খুব বোকা। ত াছাড়া কোনও মানুষের জীবনে পূর্বপুষের প্রভাব পড়াও অস্বাভাবিক নয়। এইসবভাবতে ভাবতে একদিন সত্যি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ল বিনয়। একটা সবেবানাশী খাদ তাকে নিচের দিকে টানছেযেন। এখন পতনই য়েন তার ভবিতব্য। এই টান এড়িয়ে যাবার শক্তি য়েন তার নেই।
আজ পঞ্চম দিন। রাণী তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে নিজের দাদার মত। সেই সম্পর্ক তুচ্ছ করে এর আগেও চারদিন বেরা পাড়া থেকে এতখানি অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে এই বামুন পাড়ায় এসে হানা দিয়েছে বিনয়। কিন্তু প্রতিবারই তাকে দরজার কাছে থেকে ফিরেও যেতে হয়েছে। দরজার কাছে কেউ যেন তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বার বার বলে, ফিরে যা, ফিরে যা একটা সুন্দর সম্পর্কের গায়ে কালি ছেটাস না, পালা পালা। আজও বিনয় নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছিল। সামনে পড়ে গেল শঙ্কর। যাক এ একরকম ভালোই, বিনয় ভাবে।

নিশ্চুপ দুটো অন্ধকার অবয়ব নিয়ে সারিবদ্ধ ঘড়ের গাদার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে বিনয় আর শঙ্কর। টিনের ছাওয়া হাম ার ঘরের সামনে এসে বিনয় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ডাক দেয়, এই শালা মদনা, বেরি আয় বলছি।
শঙ্কর এমন হাঁকড়ান শুনে অবাক হয়। তবে কেউই কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে না। তখন স্থান কালভুলে গলা তুলতে হয় বিনয়কে। ভাল হবে নি মদনা, জানে মরবি, বেরি আয়। আমার চোখকে ফাঁকি দিবি তুই?
এবারে কে যেন হামারের দরজা খুলে দৌড়ে এসে বিনয়ের পায়ের উপর পড়ে। চাপা স্বরে কাঁদতে বলে, বাঁচাও বাবু। প্র াণে মেরো নি। বউ ছ্যানা সব না খেয়ে মরবে। গরীব লোক, অভাবের জ্বালায় ভুল করেছি। মাফ কর।
---শালা অন্ধকারে ধান সরাবার তালে ছিলু?
---বাঁচাও বাবু। মাফ কর। মাফ কর। মদন পা ছাড়ে না।
শঙ্কর সম্পূর্ণ কাহিনী আন্দাজ করতে পারে। যে কাজেই আসুক, এর আগে বিনয় মদনকে হামারে দেখেও কিছু বলে নি। এখন শঙ্করের সামনে ম্যানেজারি ফলাচ্ছে। মনে মনেই একটা খিস্তি আওড়ায় শঙ্কর।
মদন এ ঘরের বারোমাস বাঁধা কাজের লোক। ঘরে মানুষ বলতে একা রাণী আর রান্নার ঝি। তার ওপরশয্যাশায়ী গীর ঝ ামেলায় সারাদিন বিশৃঙ্খলা। এরকম অবস্থায় যত সুরক্ষিতই থাকুক না কেন পুরানো লোক মদনের পক্ষে হামারের চাবিট া জোগাড় করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।
বিনয় মদনকে বলে, উঠ শালা। আর কখনো যদি দেখি, তাড়াজাঁক দিয়ে মারব তোকে। ঘরের ভিতর কি গোল হচ্ছে শুনতে পাউ নি?
---আজ সন্ধ্যা থিকে গিন্নির খুব বাড়াবাড়ি।
---সেটা জেনেও ডাক্তারকে না ডেকে এনে হামারে ঢুকছু ধান চুরি করতে?
--- খবর দিচ্ছি গো ডাক্তারকে। বলল, সকালে যাবো। বাবু, বোলো নি কো একথা গিন্নিকে। আর কুনোদিন হবে নি এমন।
মদন কেঁদে ফেলে।
মদনের লোভ কমই। দশ বিশ সের মাত্র ধান সে সরায় মাঝে মধ্যে এবং এর পিছনে তার অভাবই সবচেয়েবড় কারণ। যদিও সুযোগ থাকে তবুও রাতারাতি পরের ধনে ধনী হবার সখ তার নেই। তবু যেহেতু সে আজ হাতে নাতে ধরা পড়েছে এবং যেহেতু সে খুবই দুর্বল তাই তাকে একতরফা ক্ষমা চাইতে হয়। এত রাতে ভিন পাড়ার দুজনকে দেখে সেও তো পাল্টা প্রশ্ন করতে পারতো। কিন্তু তেমন প্রশ্ন করার মত জোরটুকু তার নেই। কারণ সে জানে বিনয় বেরার মত মানুষদের পায়ের তলায় বসে সারাটা জীবন তাকে কাটিয়ে যেতে হবে। সে আশ্রয় নিজের হাতেনষ্ট করা তার পক্ষে অসম্ভব।
দরজার কাছে গিয়ে বিনয় ডাক দেয়, রাণী ও রাণী, দরজা খোল।
একটু আগেও সে এ দরজার কাছে এসেছিল, রাণীকেই ডাকবে বলে। কিন্তু তখন তার গলায় একটুও স্বর ফোটেনি। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, ঘামছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর ফিরে যেতে হয়েছিল চুপচাপ। আর এখন সেই তারই গলায় কত জোর।
ঝি এসে দরজার হুড়কো খুলে দেয়। ঘরের ভেতর থেকে রাণী গলা তুলে বলে, আসুন বিনয়দা।
খুব বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসবার পর প্রিয়জনের সাড়া পেলে যেমন খুব আনন্দ হয়, রাণীর ডাকেবিনয় ঠিক তেমনই স্ব াদ পায়। সে অসঙ্কোচে অন্যান্য দিনের মত ঘরের ভেতরে ঢোকে। তার পিছনে মদন আর শঙ্কর।
--- ক-দিন আসা হয় নি বলে জেঠীর খবরও কিছু পাইনি। মদনই তো এত রাতে খবরটা দিল। রাস্তা ধারের জলায় শঙ্কর মাছ ধরতেছিল। তাকেও ধরে আনছে।
খুব ভাল করছেন। আমি তো সন্ধে থেকেই ওকে বলছি আপনাকে ডাকতে। কিন্তু সেই যে ন-টার সময় বাড়ি গেল আর ব াবুর দেখাটি নেই। আপনি এলে মায়েরও কষ্ট যেন কত কমে যায়। তারপর শঙ্করকে দেখে রাণী বলে, বোসো শঙ্করদা।
না না, মদন তো তার ঘরে যায় নি। ডাক্তার ডাকতে গেছে। ডাক্তার বলেছে সকালে আসবে। তারপর ছুটছে আমার ক াছে। বিনয় বলে। পর পর সাজানো মিথ্যে কটি কথা সহজে বলে ফেলতে পেরে সে মনে মনে বেশ স্বস্তিপায়।
শঙ্কর শুধু দেখে। এ বাড়ির এত ভিতরে সে কোনওদিন ঢোকে নি। এত কাছ থেকে কখনও দেখেনি রাণীকে। তাই তার চোখে কেবল বিস্ময়। পূর্ণিমার পর চন্দ্রকলায় যেন ক্ষয় শু হয়েছে। মুখের গৌরবর্ণে পড়েছে দুশ্চিন্তার তামাটে ছোপ। তবু রাণীর

নাম সার্থক, শঙ্কর ভাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার খুব দুঃখ হয়। এমন একটা মেয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে পারে যে কে
ানদিন। তারপর?
রাণী মায়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, মা তোমাকে দেখতে এসেছে বিনয় দা। ও পাড়ার শঙ্করদাও এসেছে।
দীর্ঘ রোগভোগের ফলে ফর্সা মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সুন্দর চোখ দুটি প্রায় অন্ধ। শহরের ডাক্তার এলিয়ে দিয়েছে। এখন শুধু অসহ্য পেটের যন্ত্রণা কমানোর জন্য একটা মাত্র ট্যাবলেট খেতে হয় দু-বেলা। সেই শীর্ণ কমলা ঠাকুরণ চোখ মেলে তাকালেন। যন্ত্রণা বোধহয় এখন একটু কম। অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চোখ রেখে বললেন, বোসো বাবা শঙ্কর। আগে তো আসতে মাঝে মাঝে। এখন আর আসোই না। তোমাদের এ বোনটিকে দেখো বাবা। মেয়েটা আমার জলে ভেসে যাবে। জ্ঞাতি - ভাগারিদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আমার দু-চোখ বুজলেই সম্পত্তিটুকু লুটে পুটে খাবার ত ালে আছে। অন্য পাড়ার মানুষ হলেও তোমরাই আমার আপন।
খুব কষ্ট করে দম নিয়ে বলা কথা কটা শঙ্করের বুক ছুঁয়ে যায়। সে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারে না। চুপচাপ নিচের দিকে মুখ করে বসে থেকে বারবার কল্পনায় নিজেকেই দেখতে চেষ্টা করে।
তারপর চোখটা আন্দাজ মত একটু অন্যদিকে সরিয়ে কমলা ঠাকুণ বলেন, তোকে আর কি বলব বাবা, বিনয়? বুঝতেই প ারছি আর বড় জোর দুটো একটা দিনই মাত্র আছি। বোনটাকে বিয়ে দিয়ে একটু গুছিয়ে দিস বাবা। তুই ছাড়া আমার অ ার কে আছে বল?
বিনয়ের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একথা আগেও অনেকবার শোনা। তবু সেই পুরানো কথাগুলোই আজ কেন যেন তীরের মত পাঁজর ভেদ করে বুকে গিয়ে আঘাত করে। জবাবে ধরা গলায় বিনয় শুধু বলতে পারে, তুমি বেশি কথা বোলো নি জেঠী। আমি তো আছি। তোমার চিন্তা কি?
মদন বাকি রাতটুকুও এখানেই থাকবে ঠিক হয়। বিনয় আর শঙ্কর একসঙ্গে খামার পর্যন্ত আসে। শঙ্করের মন ছেয়ে আছে কেবল দুঃখভারে। আর বিনয়ের মনে অনুতাপ। নিজের উপর যেন সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সে। ভাবছে বাপ - ঠাকুদ্দ ার স্বভাবের উত্তরাধিকারের ফাঁদ থেকে তার আর কোনমতে মুক্তি নেই। এরকম ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম অন্ধকার রাত তো অ াসতেই পারে। আর সব রাতেই যে ব্যর্থতা লেখা থাকবে এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়?
যেন চরাচরময় অন্ধকারের বুকে ক্ষণিকের জন্য একবিন্দু চকমকির আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে বামু জেঠীর কণ আর্তি, রাণীর ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর মুখ। এই আলোটুকু নিভে যাবার আগেই যা কিছু করার তা করে ফেলতে হবে।
--- আমারশ্বশুর গরে মাছ ধরতে যেয়ে সেবার যে বামু ছোকরাটাকে দেখ্ছিলু তোর মনে আছে শঙ্কর? লেখাপড়া জানা, সৎ, রোগা লম্বা মতন, খুব গরীব মনে আছে ? আরে সেই শরৎ নাকি কি যেন নাম--অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করে বিনয়।
--- হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। কত তাস খেললম একসঙ্গে। মনে থাকবে নি কেন ঞ্জ পাড়ার পশ্চিম দিক করে ঘর তো? মনে অ াছে। শঙ্কর বলে।
--- তাকে মানাবে নি রাণীর সঙ্গে?
--- হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর মানাবে। ভালই হবে।
তবে তুই কালই একবার চলে যা শঙ্কর। কথাটা পেড়ে দেখ। শরতের বিধবা মা নারাজ হবে নি মনে হয়। এদিকে জেঠীর অবস্থা দেখলু তো, দুদিন পারাইলে ঢের।
--- যাবো। যাবাটা তো কর্তব্য। ঠাকণকে দেখে দুচোখ ফেটে জল আসছিল আমার। যাবো আমি। শঙ্কর বলে।
তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ায়, বিনয় আর শঙ্কর।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com